ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
****

ফিচার-৪৩(আগরতলা-১২।১০)
আগরতলা, ১২ অক্টোবর, ২০১৭ ।।

কৃষক আন্দোলনের অতীত ইতিহাস ছোঁয়া গোলাঘাটি এখন পর্যটনের নতুন হাতছানি

।। স্নেহময় রায় চৌধুরী ।।

ঘড়ির কাঁটা তখন দু'য়ের ঘরে। বিদায়ী শরতের সূর্য মাথার উপর থেকে ছড়িয়ে দিয়েছে সোনালী রোদ্দুর। নীল আকাশের গায়ে সাদা মেঘ ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক। বুড়িমা নদীর দুই পাড় সেজে আছে সাদা কাশ ফুলে। যেদিকে চোখ যায় সবুজ আর সবুজ। প্রকৃতি যেন নিজ হাতেই সবুজের গালিচায় সাজিয়ে তুলেছেন ভক্তঠাকুর ঘাটকে। সেদিনের সাক্ষী সবুজ টিলাগুলি আজও দাঁড়িয়ে আছে শহীদ ভূমির চারদিকে অতীত ইতিহাস গায়ে মেখে। সেই সময়ের অনেকেই এখন আর নেই। যাঁরা আছেন তাঁরাও আজ বয়সের ভারে ক্লান্ত। ক্লান্ত স্মৃতির ভারে, ক্লান্ত ব্যথার ভারে, তাঁরা ক্লান্ত এলাকায় এলাকায় শান্তি বিনষ্টের চক্রান্তের ভয়ে। আর এই ক্লান্তি মাড়িয়েই তখিরায় দেববর্মারা ছুটে এসেছেন ইতিহাসের সাক্ষী হতে, হৃদয়ের টানে। আর এক আবেগ মথিত পরিবেশে দুপুর দু'টোয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার যখন শহীদ স্মৃতি সৌধের উদ্বোধন করলেন, বিষন্ন শরীরেও তাঁদের চেহারায় দেখা গেল এক চিলতে গর্বিত হাসির রেখা। মানুষের চোখের জলে ভারী হয়ে উঠল বাতাস। কয়েকশ মানুষের করতালির আওয়াজ অনুরণিত হতে লাগল পুরো ভক্তঠাকুর পাড়ায়। বিষন্ন চেহারায়ও এক সন্তোষের ঝিলিক দেখা গেল উপস্থিত এলাকাবাসীর মুখে, রাজ্য সরকার সেদিনের শহীদদের সম্মান জানানোর যে উদ্যোগ নিলো, তার জন্য।

বলছিলাম ২৩ আশ্বিন, ১৪২৪ বাংলা (গত ১০ অক্টোবর, ২০১৭)-এর ভক্তঠাকুর পাড়ার কথা। ১৩৫৫ সালের এই দিনেই (২৩ আশ্বিন) গোলাঘাটির ভক্তঠাকুর পাড়ায়, এই বুড়িমা নদীর ঘাটেই বারোটি প্রাণ লুটিয়ে পড়েছিল মাটিতে। সেদিন ছিল ইংরেজী ৯ অক্টোবর, ১৯৪৮ সাল, শনিবার। সারা ত্রিপুরায় আকাল চলছিল। অনাবৃষ্টিতে ফসল হয়নি জুমে, কৃষকের ক্ষেতে। দেওয়ানী শাসনে রাজ্যে কোনও সেচের ব্যবস্থা ছিল না, অনাহারী মানুষের সহায়তার কোনও ব্যবস্থা ছিলো না। কৃষকের ঘরে চলছে অনাহার। তখন মহাজনদের সুদের ব্যবসা ছিল রমরমা। শোষণ, নিপীড়ণে অতীষ্ট ত্রিপুরার মানুষ। দাদন প্রথা জাঁকিয়ে চলছিল গ্রাম পাহাড়ে। গোলাঘাটি সহ সারা রাজ্যে যখন এই অভাব অনাহার চলছিল, বিশালগড়ের জনৈক মহাজন টাকারজলা, জম্পুইজলা সহ এই গোলাঘাটি এলাকার কৃষকদের ঘর থেকে দাদনের ধান কয়েক নৌকো বোঝাই করে বুড়িমা নদী দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। গোলাঘাটির ভক্তঠাকুর ঘাটে বিভিন্ন গ্রামের বুভুক্ষু, অনাহারক্লিষ্ট কৃষকরা সমবেত হয়ে সেই ধান আটক করে মহাজনকে সেই ধান দাদন স্বরূপ তাদের দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। ঘরে অনাহার, অভাবের কথা জানিয়ে অগ্রহায়ণ মাসে আমন ধান তুলেই সুদ সহ ধান ফেরৎ দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল কৃষকরা। কিন্তু মহাজন কৃষকদের ধান দিতে রাজী নয়, কারণ তখন পূর্ব পাকিস্তানে ধানের মূল্য খুবই বেশি। লাভও হবে বেশি। কপট মহাজন অবরোধকারী কৃষকদের ধান না দেওয়ার জন্য ছলনার আশ্রয় নিল। কৃষকদের ধান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্দিষ্ট একটা তারিখ দিয়ে বলল, 'জামিনদার - ছাড়া তো ধান বা দাদন দেওয়া যায় না। তোমরা একজন জামিনদার নিয়ে ঐ তারিখে এসো। তোমাদের ধান দিয়ে দেবো।' সহজ সরল কৃষকরা খুশি হয়ে নির্দিষ্ট তারিখেই (সম্ভবত পরের দিন) জামিনদার নিয়ে ভক্তঠাকুর ঘাটে, বুড়িমা নদীর দক্ষিণ পাড়ে (যেখানে নৌকো আটক রয়েছে) উপস্থিত হলে, উল্লিখিত মহাজনদের কথায় আগে থেকে নদীর উত্তর পাড়ে লুকিয়ে থাকা পুলিশ অতর্কিতে অনাহারক্লিষ্ট কৃষকদের উপর গুলি বর্ষণ শুরু করে। দেওয়ানী শাসকের পুলিশের গুলিতে সতীশ দেববর্মা, রাজারাম দেববর্মা, ললিত দেববর্মা, সামসু মিঞা, ইন্দ্রকুমার দেববর্মা, দেওয়ান দেববর্মা, দেবেন্দ্র দেববর্মা, সুরেন্দ্র দেববর্মা, আকুয়া দেববর্মা, নিশিকান্ত দেববর্মা, গাছি মিঞা এবং কড়া দেববর্মার মতো মোট ১২ জন আন্দোলনকারী কৃষক ঐ পুলিশি

আক্রমণে নিহত হয়েছিলেন।

এছাড়াও পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে দীর্ঘ দিন যাঁরা অসুস্থ জীবন কাটিয়েছেন, তাঁরা হলেন হরিরায় দেববর্মা, যদুমনি দেববর্মা, তখিরায় দেববর্মা, নবদ্বীপ দেববর্মা, নরেন্দ্র দেববর্মা, রাধাচরণ দেববর্মা, অশ্বিনী দেববর্মা এবং দীনমনি দেববর্মা সহ মোট দশ জন আন্দোলনকারী কৃষক। এই ঘটনায় সারা রাজ্যের মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল সেদিন দেওয়ানী শাসকদের বিরুদ্ধে। ১৯৪৫ সালে জনশিক্ষা সমিতির শিক্ষা আন্দোলন পরবর্তী সময় সামন্ত শাসনের শোষণের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় রাজ্যে যে গণআন্দোলন চলে আসছিল, সেদিনের কৃষক হত্যার পর আরও তেজি হয়েছিল সেই গণঅন্দোলন। যদিও এরপরও রাষ্ট্রশক্তির সহায়তায় আরও দীর্ঘদিন চলে আসছিল মহাজনী শোষণ।

সেদিনের আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে যাঁরা নিহত হয়েছিলেন এ বছরের ১০ অক্টোবর তাঁদের প্রতি সম্মান জানালো রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার। তাঁদের স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখতে গোলাঘাটির ভক্তঠাকুর ঘাটকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকার গড়ে তুলেছে একটি আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র - শহীদ স্মৃতি সৌধ, শহীদ স্মৃতি উদ্যান এবং শহীদ স্মৃতি খুমচাক কলাকেন্দ্র। গোলাঘাটি - টাকারজলা সড়কের পূর্ব ঢালে গড়ে ওঠা এই প্রকল্পের নাম গোলাঘাটি মার্টারস মেমোরিয়াল প্রজেক্ট। আর এই প্রজেক্টের অঙ্গ হিসেবেই বুড়িমা নদীর দক্ষিণ পাড়ে ভক্তঠাকুর ঘাটের সেই বধ্যভূমিতে গড়ে তোলা হয়েছে শহীদ কৃষকদের স্মৃতি স্মারক - ৩২ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট শহীদ স্মৃতি সৌধ, যা এদিন পর্যটক এবং দর্শকদের উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। ৭০ লক্ষ ২ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই সৌধটি দারুণভাবে সাজিয়ে তুলেছেন সরকারী কলা এবং চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা।

নদীর উত্তর পাড়ে প্রায় ২৫ কানি জমির উপর গড়ে উঠেছে আকর্ষণীয় গোলাঘাটি শহীদ স্মৃতি উদ্যানটি। যা ইতিমধ্যেই রাজ্য, দেশ এবং বিদেশী পর্যটকদের হাতছানি দিচ্ছে। প্রায় ৯ একর বা ২৫ কানি জমির উপর এই পার্ক বা উদ্যানটি গড়ে তোলা হয়েছে। রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এই প্রজেক্ট তৈরীর দায়িত্বে রয়েছে। পুরো প্রজেক্টটির জন্য রাজ্য সরকার বরাদ্দ করেছে ৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। এই প্রজেক্টের কাজ রূপায়ণে পূর্ত, পর্যটন, গ্রামোন্নয়ন, বন, জল সম্পদ, কৃষি ও উদ্যান এবং বিদ্যুৎ দপ্তর সহ বিভিন্ন দপ্তর সহযোগিতা করছে। ইতিমধ্যেই ৫ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই পার্কে পর্যটকদের জন্য গড়ে তোলা হয়েছে দু'টি ট্যুরিস্ট শেড, ক্যাফেটোরিয়া, ওয়াচ টাওয়ার, শপিং অর্কেড বা গ্রামীণ শিল্পীদের উৎপাদিত শিল্প সামগ্রীর বিপণন কেন্দ্র। রয়েছে ঐতিহ্যবাহী দু'টি টংঘর, একটি বিশ্রামাগার, বুড়িমা নদীর উপর নির্মিত সুদৃশ্য একটি ফুট ব্রিজ এবং ভিউ পয়েন্ট। এখানে গড়ে উঠবে একটি তথ্য ও মত বিনিময় কেন্দ্র এবং একটি কমিউনিটি হলও। তাছাড়াও বিভিন্ন রকম মনমুগ্ধকর ফুল ও বাহারী গাছে আরও সুসজ্জিত করে তোলা হবে এই উদ্যান, যা পর্যটকদের নন্দিত করবে। এছাড়াও এই পার্কে থাকবে পর্যটকদের মনোরঞ্জনের জন্য একটি মুক্ত থিয়েটার মঞ্চ, শিশু উদ্যান এবং মনমুগ্ধকর স্যান্ড মিউজিয়াম বা বালির ভাস্কর্যের যাদুঘরও।

আম্রপালী সহ বিভিন্ন গাছের পাশ দিয়ে সুন্দর চেকার টাইলস লাগানো রাস্তাটি পর্যটকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। এই উদ্যান গড়ে তোলার জন্য স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছেন এলাকাবাসী। তাঁরা চান ৬৯ বছর আগে মহাজনের শোষণ, অত্যাচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে তাঁদের পূর্বপুরুষরা যাঁরা জীবন দিয়েছিল পুলিশের গুলিতে, এখানে তাঁদের স্মৃতিতে কিছু একটা গড়ে উঠুক। এর জন্য জমি দিতে তারা সহযোগিতা করতেও প্রস্তুত। এই উৎসাহ নিয়েই এলাকার ব্রজমোহন দেববর্মা, সরুমোহন দেববর্মা, সুমেন্দ্র দেববর্মা, নবকুমার দেববর্মা, রমনী মোহন দেববর্মা, গোপীকান্ত দেববর্মা, ফাল্গুন দেববর্মা, বিষ্ণুকুমার দেববর্মা, সন্তোষ দেববর্মা, নেপালচন্দ্র দেববর্মা এবং অজিত কুমার রায়দের মতো বড় মনের গ্রামবাসীরা স্বেচ্ছায় জমি দান করেছেন শহীদ স্মৃতির উদ্দেশ্যে। তাদের ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়েছে বামফ্রন্ট সরকারও। রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিয়ে এখানে এই পার্ক বা উদ্যান গড়ে তুলেছে। মাইল দুই-তিনেক দূরে দয়ারাম পাড়াতে গড়ে তোলা হয়েছে সুদৃশ্য একটি কমিউনিটি হলও। ৩২৪ আসনের এই কমিউনিটি হলের নাম দেওয়া হয়েছে গোলাঘাটি শহীদ স্মৃতি খুমচাক কলাকেন্দ্র, যেখানে এখন এলাকার শিল্পীরা আমাদের ঐতিহ্যময় সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ পাবেন।

এই প্রজেক্টের উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে এদিন বাস্তব অর্থেই এক উৎসবে পরিণত হয়েছিল পুরো এলাকা। চিরাচরিত পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে এই উৎসবের শরিক হতে ছুটে এসেছেন উপজাতি নারী-পুরুষ। উপস্থিত ছিলেন বহু অউপজাতি মানুষও। সবার মুখেই খুশির ছাপ, সবার অন্তরেই শান্তির আবেশ। ৬৯ বছর আগের শহীদ কৃষকদের

স্মৃতিতে এই প্রজেক্ট গড়ে তোলার জন্য খুবই খুশি এলাকার দীনেশ দেববর্মা, মনোরঞ্জন দেববর্মা, ধীরেন্দ্র দেববর্মা এবং কলাবতী দেববর্মারা। ৬৯ বছর আগে খাদ্যের জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে খেটে খাওয়া যে কৃষকরা সরকারী বাহিনীর হাতে শহীদ হয়েছিলেন, কোনও সরকার তাঁদের সম্মানে এখানে এত বড় একটি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলবে - ভাবতেও পারেনি তারা। বুড়িমা নদী আর কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে মনোরম এই পর্যটন কেন্দ্র। এই পর্যটন কেন্দ্রকে শুধু দর্শনীয় স্থান হিসেবেই দেখছেন না এলাকাবাসী। শহীদ পূর্বপুরুষদের সম্মান এবং স্মৃতি রক্ষার পাশাপাশি এই পর্যটন কেন্দ্রকে এলাকার উন্নয়নের সোপান হিসেবেও মনে করেন তারা। পর্যটন কেন্দ্রটির বিকাশে এখানে যেমন পর্যটকদের আগমন বৃদ্ধি পাবে, এর পরিপ্রেক্ষিতে এলাকার অর্থনৈতিক বিকাশও ত্বরান্বিত হবে আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ইতিমধ্যেই আশেপাশে ছোট ছোট দু-একটি দোকান বসতে শুরু করেছে। স্থানীয় উপজাতি রমনীরাই চা, বিস্কুট, খাবার জিনিস, পান, ইত্যাদি নিয়ে বসেছেন দোকানে। আরও দোকান হবে, ব্যবসা বাড়বে, আর্থিক অবস্থার আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে - আশা করেন এলাকারই অধিবাসী মঙ্গলকন্যা দেববর্মা। শ্রী বৃদ্ধি ঘটবেও। পর্যটকদের আগমন যখন বৃদ্ধি পাবে বাড়বেই তো বেচাকেনা। তবে এর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ রক্ষা করতে হবে। পর্যটনের সাথে শান্তি, শৃঙ্খলা শব্দটির গভীর এক সম্পর্ক রয়েছে। সৌন্দর্যের বিশেষ একটা সম্পর্ক রয়েছে। এলাকার শান্তি, শৃঙ্খলা বজায় থাকলে, পর্যটন কেন্দ্রটি আকর্ষণীয় হলে পর্যটক তো যাবেনই। আর এই শান্তি, শৃঙ্খলা রক্ষায় এবং দেশ-বিদেশের মানুষ যাতে নিজেদের শহীদ হওয়া পূর্বপুরুষদের পরিচয়টা জানতে পারেন সেই বিষয়টাই আশা করছেন এলাকার যুবকরাও।

*****